ইতিহাস এষণা

৩

সম্পাদনা

সিদ্ধার্থ গুহ রায়

ইতিহাস এষণা

৩

সম্পাদনা

সিদ্ধার্থ গুহ রায়

বঙ্গীয় ইতিহাস সমিতি কলকাতা

Itihas Eshana
3

ইতিহাস ও ইতিহাস আশ্রিত বিষয় নির্ভর আন্তর্জাতিক
আলোচনাচক্রে পঠিত গবেষণাধর্মী আন্তর্বিদ্যাশৃঙ্খলামূলক
বিশেষজ্ঞ শংসায়িত নির্বাচিত প্রবন্ধাবলী

A collection of peer-reviewed selected interdisciplinary research papers presented at the International Conferance of Bangiya Itihas Samiti Kolkata held at Sanskrit College and University, Kolkata on 24th and 25th August 2019

ISBN : 978-81-929386-9-1

প্রথম প্রকাশ
২৫ মার্চ, ২০২২

কপিরাইট
বঙ্গীয় ইতিহাস সমিতি, কলকাতা

প্রকাশক
বঙ্গীয় ইতিহাস সমিতির কলকাতা-র পক্ষে কানাইলাল চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক
কলকাতা ৭০০ ০০৭ থেকে প্রকাশিত

বর্ণসংস্থাপন: সম্পাদনা ও পরিমার্জন
বিকাশ চৌধুরী

মুদ্রণ
নিম্বার্ক অফসেট
৪এ, পটলডাঙ্গা স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০০৯

মূল্য ৮০০.০০

সূচিপত্র

১. মনু সংহিতা : ব্রাহ্মণ্য মৃত্যু দর্শনের গঠনমূলক পর্ব–একটি সমীক্ষা ৭
ঋতুপর্ণ চট্টোপাধ্যায়

২. মিথিলার সমাজ ব্যবস্থার উপর পঞ্জী-প্রবন্ধের প্রভাব ১৫
সেখ রিয়াজুল মিদ্দে

৩. ভৌমকর রাজবংশ ও তার সামন্তদের ধর্মীয় ইতিহাস : এক লেখতাত্ত্বিক গবেষণা ২২
মলয় দাস

৪. অতীতের নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ৩১
বিপ্লব কুমার চন্দ্র

৫. দক্ষিণবঙ্গের পোড়ামাটির শিল্পধারায় নারীমূর্তি : একটি সমীক্ষা ৩৮
উৎপল বিশ্বাস

৬. অর্থশাস্ত্রের আলোকে বাস্তুসংস্থান ও স্বাস্থ্যবিধি : একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা ৪৬
স্বাগত ভট্টাচার্য্য

৭. ভারতীয় চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিবর্তনের ইতিহাস : একটি প্রাথমিক রূপরেখা ৫৪
শুভঙ্কর কুণ্ডু

৮. বাংলার সংস্কৃতি চেতনায় বাঙালি মুসলমান সমাজ ৬১
মহঃ মইনুল ইসলাম

৯. মুঘলযুগের প্রশাসনিক ইতিহাস : প্রসঙ্গ ভারতীয় ফারসি শব্দ ৬৮
মো. আবুল হাসেম

১০. মন্দির ভাস্কর্যে নারী : প্রসঙ্গ হাওড়া জেলা সপ্তদশ শতক থেকে ঊনবিংশ শতক ৭৭
ডালিয়া হাজরা

১১. প্রাগাধুনিক বঙ্গ-সমাজে শ্রেণি সচলতা : ত্রয়োদশ শতক–ষোড়শ শতক ৮২
আলোকপর্ণা বসু

১২. আদি–মধ্যযুগের প্রেক্ষাপটে প্রাণীবিজ্ঞানচর্চা : ফিরে দেখা ৯০
ঝিনুক সরকার

১৩. আদিমধ্যযুগ ও মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাসে গড়মান্দারনের গুরুত্ব ৯৭
সঞ্জিত মণ্ডল

১৪. মুর্শিদাবাদের হারানো পটের গান : একটি সমীক্ষা ১০৩
দীপাঞ্জন দে

১৫. পঞ্চানন বর্মার সমবায় ভাবনা ১১১
সৌমেন্দ্র প্রসাদ সাহা

১৬. উনিশ শতকে বাংলার কৌলীন্যপ্রথা ও হুগলির নারী–সমাজ জীবনের করুণ চিত্র ১১৮
সুদীপ্তা মুখার্জ্জী

১৭. উনিশ শতকে বাংলায় শহুরে বুদ্ধিজীবীদের জ্ঞানচর্চা ও সভা, সমিতি, ১২৫
প্রতিষ্ঠানের ইতিহাসে হাওড়ার অংশগ্রহণ : ক্যানিং ইন্সটিটিউট
সায়ন দে

১৮. ঔপনিবেশিক যুগের নগরায়ণে নবাবগঞ্জ পৌরসভা ১৩৩
মধুমিতা মণ্ডল (বেরা)

১৯. মুর্শিদাবাদ জেলার কাঁসা শিল্প ও কংসবণিক সম্প্রদায়ের ইতিহাস ১৪১
সুমিতকুমার মণ্ডল

২০. দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার লৌকিক পূজা পার্বণ ও মেলা : ১৫০
একটি সামাজিক ও ধর্মীয় পর্যালোচনা
নবনীতা সরদার

২১. আঠারো-উনিশ শতকে পূর্ব ভারতে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া ১৫৭
কোম্পানির আফিম বাণিজ্য ও দেশীয় বণিকদের ভূমিকা
অমৃতা শেঠ

২২. ঔপনিবেশিক পর্বে মেদিনীপুর জেলায় সাঁওতাল সম্প্রদায়ের ১৬৫
মধ্যে আধুনিক শিক্ষার বিস্তার : একটি সমীক্ষা
বিশ্বজিৎ মল্লিক

২৩. 'মারী নিয়ে ঘর করি' : ঔপনিবেশিক পর্বে নদীয়া জেলার ১৭২
জনজীবন ও স্বাস্থ্যে ম্যালেরিয়া : উন্নয়ন বনাম পরিবেশ-প্রসঙ্গ
শিপ্রা সরকার

২৪. বন্যা ও বীরভূম জেলার লোকভাবনা (১৮৫৮-১৯৫০) ১৮০
মুসাদ্দেক হোসেন

২৫. বঙ্গীয় বীমা ব্যবসার উদ্ভব ও বিকাশে স্বদেশী আন্দোলনের ভূমিকা ১৮৮
অমর ঘোষ

২৬. হিন্দু বিধবা বিবাহ আইন (১৮৫৬) ও তার মূল্যায়ন : ১৯৫
সমকালীন পত্রপত্রিকা ও সরকারী নথিভিত্তিক বিশ্লেষণ
নীলাঞ্জনা পাত্র

২৭. তারাপীঠ মন্দিরের পাণ্ডা সম্প্রদায় : একটি আর্থ-সামাজিক সমীক্ষা ২০৩
গোপীনাথ সরকার

২৮. সত্যাগ্রহ সন্ধানে : দুই তীর্থস্থান শুদ্ধিকরণ আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ২১২
সৌমেন মণ্ডল

২৯. কলকাতার ট্র্যাফিক সমস্যার স্বরূপ অনুসন্ধান : ফিরে দেখা বিংশ শতকের প্রথমার্ধ ২২১
অভিজিৎ সাহা

৩০. জাতীয়তাবাদী গণ-আন্দোলন সংগঠনে বাংলা সাময়িকপত্র-পত্রিকার ভূমিকা : ২২৮
আইন-অমান্যের পরবর্তী কাল থেকে ভারতছাড়ো আন্দোলনের পূর্ববর্তী
সময়কালের নিরিখে একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা
দেবাশীষ পাল

৩১. বাংলার বাগদি সমাজ : পেশা, সংকট ও তার বিবর্তন ২৩৬
মিলন রায়

৩২. শান্তিপুরের শিক্ষাব্যবস্থা : একটি পর্যালোচনা ২৪৫
সায়ন চৌধরী

৩৩. স্বাধীনোত্তর হিমালয়বঙ্গে জাতপাতের রাজনীতিতে অনগ্রসর সম্প্রদায়ের ভূমিকা ২৫৩
সুব্রত বাড়ই

৩৪. মার্কসীয় বীক্ষায় নারী আন্দালন এবং কনক মুখার্জি ২৬০
পারমিতা সরকার

৩৫. স্বাস্থ্য সচেতনতা ও একটি সংগঠন : প্রসঙ্গ মুর্শিদাবাদ জেলা বিজ্ঞান পরিষদ ২৬৯
শুভেন্দু বিশ্বাস

৩৬. কল্যাণীর নগর পরিকল্পনায় পরিবেশ ভাবনা ২৭৬
প্রণব মিস্ত্রী

৩৭. উত্তরবঙ্গে তামাক চাষের বাণিজ্যিক গুরুত্বের ক্রমাবনতি: প্রসঙ্গ উত্তর স্বাধীনতা কালপর্ব ২৮৪
চন্দন অধিকারী

৩৮. অল ইন্ডিয়া ইন্সিটিউট অফ হাইজিন অ্যান্ড পাবলিক হেলথ ও ভারতীয় সমাজে তার প্রভাব (১৯৩২-১৯৮২) ২৯২
শিল্পী দত্ত

৩৯. স্বাধীনতা উত্তর-পর্বে চটকল শ্রমজীবীদের রাজনৈতিক জীবন : প্রসঙ্গ ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চল (১৯৪৭-২০১১) ২৯৯
শত্রুঘ্ন কাহার

৪০. শঙ্খ : মুর্শিদাবাদের একটি ঐতিহ্যবাহী অসংগঠিত শিল্প ও তার শ্রমিকের সন্ধানে (১৯৪৭-২০১১) ৩০৭
প্রসেনজিৎ মুখোপাধ্যায়

৪১. বাংলাদেশে বিরাজিত ভাষাসমস্যার চালচিত্র ও তা নিরসনকল্পে প্রয়োজনীয় ভাষানীতির রূপরেখা ৩১৬
এ.বি.এম. রেজাউল করিম ফকির

৪২. চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলে ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠার সূচনা পর্ব ৩২৭
আনন্দ বিকাশ চাকমা

৪৩. নেপালে ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের রাজনৈতিক অধিকার আন্দোলন ৩৩৭
অরুণ ঘোষ ও আনন্দ গোপাল ঘোষ

ইতিহাস এষণা ৩
ISBN : 978-81-929386-9-1

ঔপনিবেশিক পর্বে মেদিনীপুর জেলায় সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মধ্যে আধুনিক শিক্ষার বিস্তার : একটি সমীক্ষা

বিশ্বজিৎ মল্লিক*

সারসংক্ষেপ : ঔপনিবেশিক পর্বে মেদিনীপুর জেলায় শিক্ষা বিস্তারের ইতিহাস একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মেদিনীপুরে পাঠশালা ও জেলা স্কুল সেই সময় শহরাঞ্চলে শিক্ষার মাধ্যম ছিল। বিশেষ করে জেলার পশ্চিম প্রান্তের অঞ্চলগুলিতে শিক্ষার বিস্তার ঘটানো সহজ কাজ ছিল না। ঐ সমস্ত অঞ্চলগুলিতে সাঁওতাল সম্প্রদায় অরণ্যকে নির্ভর করে জীবন যাপন করত। দু চারজন রাজা জমিদার ধনাঢ্য ব্যক্তি সংস্কৃত শিক্ষায় নিজেদের বিকশিত করেছিলেন গৃহ শিক্ষকের কাছে নয় বাইরে থেকে। ১৮৩৩ খ্রীঃ নতুন সনদ আইন এর বলে পৃথিবীর সব দেশের মিশনারিরাই ভারতে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের অধিকার লাভ করেছিলেন। মেদিনীপুরে আগত মিশনারিরা লন্ডনের free will Baptist missionary society-এর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আনুমানিক ১৯২১ খ্রীঃ কাছাকাছি সময়ে American foreign missionary society-এর হাতে এই জেলার কাজ কর্মের দায়িত্ব ন্যস্ত হয়। মেদিনীপুরে আমেরিকান মিশনের উদ্যোগে সাঁওতালদের জন্য ৩০টি পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রাথমিক পর্বে মিশনারিরা মেদিনীপুর সদর শহর কে কেন্দ্র করে তাদের ধর্ম প্রচারের কাজ করতে তৎপর ছিলেন। মিশনারিরা জেলার আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিকেও তাদের কাজের ক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার আলো দিতে মিশনারীরা ৪২টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং একটি নর্ম্যাল স্কুল পরিচালনা করতেন। ম্যাক আলপিনের রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, মেদিনীপুরে সাঁওতালদের জন্য শিক্ষা সম্বন্ধে তথ্য খুবই কম ছিল, মিশনারিদের নেতৃত্বে ৪৫ টি প্রাইমারি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়, যেখানে সাঁওতাল এবং অন্যান্য আদিবাসীরা লেখাপড়া শিখত। প্রত্যেকটি স্কুলে গড়ে ২০ জন ছাত্রছাত্রী ছিল। একসাথে ৯০০ বালক এবং ১৯০ জন মেয়ে লেখাপড়া শিখত। ১৯১১ সালের মেদিনীপুর জেলা গেজেটিয়ার থেকে জানা যায় যে, মেদিনীপুর জেলায় ৮টি গুরু ট্রেনিং স্কুল ছিল যেখানে ট্রেনিং নিয়ে প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষক হওয়া যায়। ম্যালি সাহেব লিখেছেন ৫৯টি মিশনারি স্কুল ছিল সাঁওতাল সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েদের জন্য, ১৯০৮-০৯ সালে এই স্কুল গুলোতে ২৭৮৪ জন সাঁওতাল ছেলে মেয়ে পড়তো বলে জানা যায়। ঔপনিবেশিক পর্বে জেলার পশ্চিম প্রান্তে অরণ্য সঙ্কুল অঞ্চলগুলিতে মানুষের জীবন যাপন করাটা ছিল খুবই কষ্টকর।

সেই জায়গায় একটা শিক্ষার পরিবেশ তৈরি করে শিক্ষার বিস্তার ঘটানো সহজ ছিল না কিন্তু মিশনারিগণ সমস্ত বাধাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে সাঁওতাল ছেলে মেয়েদের জন্য শিক্ষা বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ

* সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, মেদিনীপুর সিটি কলেজ।

ভূমিকা নিয়েছিলেন। মিশনারিদের দূরদৃষ্টি মানসিকতা সাঁওতাল ছেলেমেয়েদের ও মেদিনীপুর জেলার শিক্ষার ক্ষেত্রকে অনেকটা মজবুত করেছিল।

সূচক শব্দ : মেদিনীপুর, ঔপনিবেশিক, সাঁওতাল, শিক্ষা, আধুনিক, অরণ্য, বিদ্যালয়, মিশনারী।

শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড, শিক্ষা মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোয়, অবচেতনকে চেতনায়, অজ্ঞানতা থেকে জ্ঞানের আলোয় নিয়ে আসে, কিন্তু ঔপনিবেশিক পর্বে শিক্ষার পরিবেশ ছিল ভয়াবহ। ইংরেজ সরকার তাদের সুবিধামত শিক্ষার ক্ষেত্রে কিছু রদ বদল করলেও তার ব্যাপক পরিবর্তন করেননি বা করতেও চায়নি, কারণ তাদের সাম্রাজ্যের ভবিষ্যত কে সুরক্ষিত করাটা বড়ো লক্ষ্য ছিল। ইংরেজ সরকার শিক্ষার ক্ষেত্রে মনোযোগী না হলেও দেশের বিভিন্ন প্রান্তেই কম বেশি দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। ঔপনিবেশিক পর্বে মেদিনীপুর জেলাও শিক্ষার দিক থেকে খুব বেশি পিছিয়ে ছিল না। জেলার শহরাঞ্চলগুলিতে শিক্ষার ব্যবস্থা থাকলেও গ্রাম এবং জেলার পশ্চিম প্রান্তে অরণ্য সঙ্কুল অঞ্চল গুলিতে সাঁওতাল সম্প্রদায় শিক্ষার দিক থেকে পিছিয়ে ছিল। ঐ পশ্চাৎপদ এলাকাগুলিতে শিক্ষার আলো পৌঁছে দিয়েছিল মিশনারিগণ।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ১৮৯২ খ্রী: এইচ স্ট্র্যাচির প্রতিবেদন থেকে জানা যায় মেদিনীপুরের সাধারণ জনগণের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা গ্রহণের আগ্রহ ছিল প্রায় অনুপস্থিত।[১] পাঠশালা শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল সেই সময় মেদিনীপুরের একটি স্বতন্ত্র শিক্ষার মাধ্যম, ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার পূর্বে পাঠশালা শিক্ষা ব্যবস্থা মেদিনীপুরে ব্যাপক প্রসার লাভ করেছিল। উইলিয়াম অ্যাডামের পরিসংখ্যান অনুযায়ী জেলায় পাঠশালার সংখ্যা ছিল ৫১৮ টি, তবে পাঠশালার পরিসংখ্যানে দেখা যায় বর্ধমানের পরেই ছিল মেদিনীপুর।[২] ১৮৭১ এর পরবর্তীকালে মেদিনীপুরের জেলাশাসক এইচ. এল. হ্যারিসন প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের জন্য পাঠশালা গুলির উন্নতি বিধানে যে পদ্ধতি অবলম্বন করেন, তা The Midnapore System of Primary Education নামে পরিচিত, বিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকেই শহরের অনেক পাঠশালারই রূপান্তর ঘটে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে।[৩] ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে মেদিনীপুরে সরকারি উদ্যোগ ও স্থানীয় সুহৃদয় ব্যক্তিদের প্রচেষ্টায় মেদিনীপুরে প্রথম ''জেলা স্কুল'' স্থাপিত হয়। জেলা স্কুলের প্রথম প্রধান শিক্ষক ছিলেন টিও সাহেব।[৪] পরে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ রাজনারায়ণ বসু প্রধান শিক্ষক হিসেবে কর্মভার গ্রহণ করেন। তিনি ঐ পদে ছিলেন ১৮৫১ খ্রী: ২১শে ফেব্রুয়ারি থেকে ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দের ৬ই মার্চ পর্যন্ত। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি জেলায় আধুনিক শিক্ষা বিস্তার, আধুনিক চিন্তা চেতনা গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। নিম্নে ১৮৭০ সালের শিক্ষার একটি বিবরনী দেওয়া হলো এর থেকে সেকালের জেলার শিক্ষা ব্যবস্থার একটি ক্ষুদ্র চিত্র পাওয়া যাবেঃ

স্কুলের নাম	স্কুলের সংখ্যা	হিন্দু	মুসলমান	অনান্য শ্রেনি	মোট
(১)গর্ভনমেন্ট ইংরেজি স্কুল	১	২১৪	১১	–	২২৫
(২)গর্ভনমেন্ট বাংলা স্কুল	৮	৫৯৭	৩২	–	৬২৯
(৩)গুরু ট্রেনিং স্কুল ইংরেজি	১	৬০	–	–	৬০
(৪) সাহায্য প্রাপ্ত ইংরেজি স্কুল	১৮	৯৪৫	৫৮	৭	১০১০
(৫) সাহায্য প্রাপ্ত বাংলা স্কুল	১৯০	৫৭২৭	২৩০	৩২	৫৯৮৯
(৬) সাহায্য প্রাপ্ত বালিকা বিদ্যালয়	৪	১১৩	২৪	–	১৩৭
(৭) সাধারণ স্কুল মক্তব মাদ্রাসা	১	৩	৭২	–	৭৫

মাধ্যমিক স্কুলগুলি সরকারি সাহায্য পেলেও ছাত্রদের সাফল্যের হার ভালো ছিল না। ২১৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয় মোট ৫৪৭১ জন ছাত্র ছিল। হিন্দু ও মুসলমান ছাত্র ছিল ৪৯৮২ জন এবং সাঁওতাল খ্রিস্টান ছিল ৬৮৯ জন।[৫] উল্লেখ্য মেদিনীপুরে শিক্ষার ব্যবস্থা থাকলেও পশ্চিম দিকে বিশেষ করে অরণ্য সঙ্কুল অঞ্চলগুলিতে বসবাসকারী সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার হার ছিল না বললেই চলে। আবার শিক্ষার পরিবেশ তৈরি করাটাও ছিল খুব কঠিন। ব্রিটিশ ভারতে মেদিনীপুর প্রথমাবধি অশান্তির আগুনে পুড়েছে। প্রজাদের নিত্য তাড়া করেছে উৎপীড়নের উদ্বিগ্নতা, রাজাদের ছিল স্থায়িত্বের অনিশ্চয়তা, অরণ্যে বন্য জন্তুর হাত থেকে আত্মরক্ষা করে সংগ্রহ করতে হয় কাঠ, পাতা, ফুল, ফলমূল, মধু ও ধুনো। রোদে পুড়ে জলে ভিজে মাটিতে কঠোর পরিশ্রম করেও ফসলের জন্য তাকিয়ে থাকতে হয় আকাশের দিকে। বৃষ্টি না হলে বিগত দিনের সমস্ত বকেয়া সুদেমূলে উসুল করে নিয়ে যেত রাজার কর্মচারীরা। অভাব ছিল তাদের বড়ো সমস্যা, সেই পরিস্থিতিতে শিক্ষা শব্দটি তাদের কাছে পরিচিত ছিল না। W.W.Hunter-এর রিপোর্ট থেকে জানতে পারি এই পশ্চাৎপদ অঞ্চলে শিক্ষার পরিবেশ তৈরি করা ছিল খুবই মুশকিল।[৬] প্রথাগত ভাবে সাধারণ মানুষের জন্য শিক্ষা গ্রহণের কোনো পদক্ষেপ ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ছিল বলে মনে হয় না। যে দু ''চারজন রাজা জমিদার ধনাঢ্য ব্যক্তি সংস্কৃত শিক্ষার মাধ্যমে নিজেদের বিকশিত করেছিলেন তাঁরা হয় গৃহশিক্ষকের কাছে নয় বাইরে থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। ঠাকুরবাড়ির মহান্তদের সন্তানসন্ততিদের গৃহে শিক্ষার জন্য সংস্কৃত পণ্ডিত নিযুক্ত করা হতো, বাকিরা বাইরে অধ্যয়ন করেছেন, কিন্তু ধনাঢ্য ব্যক্তির সন্তানরা গৃহশিক্ষকের কাছে বা একক গুরুর পাঠশালায় পড়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে কিছু কিছু স্থানে পাঠশালা গড়ে উঠেছিল মনে হয়। অল্প সংখ্যক সম্পন্ন ঘরের ছেলেমেয়েরা তাতে কিছু না কিছু পড়াশোনা করত। সেই সময়ের শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের কোন প্রামাণ্য দলিল খুঁজে পাওয়া যায়নি।[৭] ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে নতুন সনদ আইনের বলে পৃথিবীর সব দেশের মিশনারিরাই ভারতে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের অধিকার লাভ করেছিল। তাই দেখা যায় ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মিশনারিদের কার্যকলাপ অত্যন্ত দ্রুত প্রসার লাভ করেছিল। এই যুগকে মিশনারি শিক্ষা প্রচেষ্টার 'স্বর্ণযুগ' বলা যেতে পারে। যেসব মিশনারী সম্প্রদায় ভারতকে কর্ম ক্ষেত্র রূপে বেছে নিয়েছিল তার মধ্যে অর্থে ও সংগঠনের শক্তিতে জার্মান ও আমেরিকানরা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[৮] মেদিনীপুর জেলায় অরণ্য সঙ্কুল অঞ্চল গুলিতে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার প্রথম ধারাবাহিক উদ্যোগ গ্রহণ করেন এই খ্রিস্টান মিশনারিরা। ঊনবিংশ শতাব্দীতে লালগড় এলাকার ভিম্পরে খ্রিস্টান মিশনারিরা দরিদ্র আদিবাসী সাঁওতালদের মধ্যে ধর্ম প্রচার শুরু করেন। আনুমানিক ১৮৩৬ খ্রীঃ Rev. Amos Sutton নামে একজন ব্রিটিশ মিশনারি উড়িষ্যার কটক জেলায় ধর্ম প্রচার করতে আসেন।

মেদিনীপুরে আগত মিশনারিরা লন্ডনের Free will Baptist missionary society-এর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। পরবর্তীকালে বেশি সংখ্যায় একদল আমেরিকান মিশনারিরা এই অঞ্চলে আসেন। এদের মধ্যে একদল উড়িষ্যায় অন্যদল মেদিনীপুর শহর এবং শহর সংলগ্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েন। এই সময়ে মেদিনীপুরে গড়ে ওঠা সোসাইটি American Baptist foreign missionary society এবং Women''s American Baptist missionary society-এর সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করেন। আনুমানিক ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে American foreign missionary society-এর হাতে এই জেলার কাজ কর্মের দায়িত্ব ন্যস্ত হয়। আমেরিকান এই সংস্থাকে Foreign mission

বলা হতো এবং ভারতে এই সংস্থা Home Mission Board হিসেবে পরিচিত ছিল। Home Mission Board-এর তত্ত্বাবধানে মিশনারিদের এবং তাদের সহযোগীরা বাংলা বিহার উরিষ্যায় সোসাইটির শাখা স্থাপন, এমনকি ছাত্রীদের জন্য হোস্টেল স্থাপন করে শিক্ষা বিস্তারে সচেষ্ট হয়েছিলেন।[৯] মেদিনীপুরে আমেরিকান মিশনের উদ্যোগে সাঁওতালদের জন্য ৩০টি পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করা হয় ২৫শে অক্টোবর ১৮৭২ সালে। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের স্কুল পরিদর্শক জানান পাঠশালা গুলির মধ্যে ১৮টি পাঠশালা মেদিনীপুর জেলায় এবং ১২টি পাঠশালা বালেশ্বর জেলায় প্রতিষ্ঠা করা হয়। Revd J.L. Phillips পাঠশালাগুলির জন্য অনুমোদন মঞ্জুর করেন। Mr. Phillips-কে Mr. Martin জানিয়েছিলেন যে ৩টি পাঠশালার মধ্যে ১২টি পাঠশালার বিষয় খুব তাড়াতাড়ি মঞ্জুর করা হয়েছে। তিনি আরো জানান পাঠশালাগুলি চালানোর জন্য প্রতি মাসে ১২০ টাকা করে তুলতে পারবেন। প্রতি মাসে টাকা তুললেও টাকা খরচের হিসাব দেখাতে হবে। প্রতি মাসে প্রাপ্ত বৃত্তি ৪০ টাকার বেশি খরচ করতে পারবেন না। ঐ টাকাটা সেই সমস্ত সাঁওতাল শিক্ষকদের জন্য খরচ করতে পারবেন যারা গ্রামের স্কুলগুলোতে শিক্ষার জন্য প্রশিক্ষণ নিতে চান।[১০] প্রাথমিক পর্বে মিশনারিরা মেদিনীপুর সদর শহরকে কেন্দ্র করে তাদের ধর্ম প্রচারের কাজ করতে তৎপর ছিলেন। তারা এখানকার মানুষদের সাথে মিশতে আরম্ভ করে, ক্রমে ক্রমে শহরের পাশাপাশি তারা এই জেলার আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিকেও তাদের কাজের ক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। সেই সময় এই গ্রামীণ অঞ্চলগুলি ছিল বন জঙ্গলে পূর্ণ যাতায়াতের ব্যবস্থা মোটেই ভালো ছিল না। গরুর গাড়ি ও ঘোড়া ছিল তাদের যাতায়াতের উপায়। এই পরিস্থিতিতে ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে মিশনারিদের উদ্যোগে সদর থেকে ৩২কিমি দূরে ভীমপুর অঞ্চলে একটি গির্জা প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং তাকে কেন্দ্র করে এই সাঁওতাল অধ্যুষিত অঞ্চলে নারীদের আরেকটি সহায়ক কেন্দ্র গড়ে ওঠে।[১১] মেদিনীপুরের আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রামে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার আলো দিতে মিশনারিরা ৪২টি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের পাশাপাশি মেদিনীপুর শহরে একটি নর্ম্যাল স্কুল পরিচালনা করতেন। ১৮৮১ সালে স্কুলের সংখ্যা দাঁড়ায় ৭৫ এবং ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা হয় ১৬০০। আবার হান্টার সাহেব ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে কিংবা তার পূর্বে খ্রীষ্টান মিশনারিদের প্রতিষ্ঠিত জেনানা মিশন-এর উল্লেখ করেছেন। এই জেনানা মিশনের সদস্যারা শহরের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে পড়িয়ে আসতেন।[১২] রেভারেন্ড জিরিময় ফিলিপস্ এর উদ্যোগে ১৮৪৫ সালে জলেশ্বরে প্রথম সাঁওতালদের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। রেভারেন্ড আর ব্যাচেলরের উদ্যোগে ১৮৬২ থেকে ১৮৭০ সালের মধ্যে মেদিনীপুর জেলায় বেশ কিছু প্রাথমিক স্কুল স্থাপিত হয়।

১৮৬৭ সালে মিশনের ৩৩টি প্রাথমিক স্কুলের প্রায় ৪৫০ জন সাঁওতাল ছাত্র পড়াশোনা করত। ১৮৬৯ সালে মিশনের স্ক্রেফসরুড সাহেব বেনাগাড়িয়ায় মেয়েদের জন্য প্রাথমিক স্কুল ও ছাত্রী আবাস তৈরি করেন।[১৩] উল্লেখ্য ওটিস রবিনসন ব্যাচেলরের চেষ্টায় মেদিনীপুর শহর থেকে ৩২কিমি দূরে জঙ্গলাকীর্ণ ভীমপুরে ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে একটি মন্ডলী গঠিত হয়, গড়ে ওঠে গির্জা, বিদ্যালয় ও ছাত্রাবাস, যে সমস্ত মিশনারিরা শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে উদ্যোগ নিয়েছিলেন তাদের মধ্যে রেভারেন্ড জিরিময় ফিলিপস, আর ব্যাচেলর, থিয়োডর বার্কহোল্ডার, এল. সি. কিচেন, এইচ, সি লঙ, প্রমুখ এর নাম উল্লেখযোগ্য। ব্যাচেলরের উদ্যোগে ভীমপুরে যে কর্মকাণ্ড আরম্ভ হয়েছিল, তা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল রেভারেন্ড থিয়োডর বাকহোল্ডার ও তাঁর স্ত্রী জুলিয়া বার্কহোল্ডার নামে মিশনারি দম্পতির বিভিন্ন পদক্ষেপে, রেভারেন্ড এল. সি. কিচেন কে সাঁওতালরা হাঁসদা গোষ্ঠীর

'চিলবিন্দা' গোত্রের একজন বলে 'ছৌটিয়ার' (সমাজভুক্ত) করে নিয়েছিল। এই কিচেন সাহেব সাঁওতালদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য ভীমপুর হাইস্কুলে সাঁওতালি ভাষা পড়াবার প্রথম ব্যবস্থা করেন এবং যতদূর সম্ভব তারই চেষ্টায় সাঁওতাল ছেলেরা ঐ স্কুল থেকে সাঁওতালি ভাষা নিয়ে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেওয়ার প্রথম সুযোগ পায়।[১৪] আবার ব্যাচেলর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টি ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে উন্নীত হয়। ১৯১৩ এর মধ্যে বিদ্যালয়টি মধ্য বঙ্গ বিদ্যালয় বা Middle vernacular school-এর রূপ পায়। এই সময় থেকে প্রতিষ্ঠানটি শুধুমাত্র বালিকাদের জন্য নির্দিষ্ট হয়।[১৫] আবার ১৯২৪ সালে ছেলেদের স্কুলটি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। ঔপনিবেশিক সময় কালে অবিভক্ত বাংলায় একমাত্র এই হাই স্কুলে নিয়মিত সাঁওতালি পড়ানো হতো এবং ছাত্ররা সাঁওতালি ভাষা নিয়ে মেট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিতে পারত। মূলত বাংলা হরফে ও রোমান হরফে তাদের পড়াশোনা হতো। যে সমস্ত শিক্ষক সাঁওতালি পড়াতেন তাঁরা হলেন প্রিয়নাথ বাস্কে, পদ্মলোচন মান্ডি, পরান চন্দ্র টুডু এবং রামচাঁদ মান্ডি। চল্লিশের দশকে যারা ভীমপুর সাঁওতাল হাইস্কুলে সাঁওতালি ভাষা নিয়ে পড়াশোনা করেছিলেন এবং ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পরবর্তী জীবনের কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে চাকুরী করেছেন কিংবা শিক্ষকতা করেছেন, তাঁদের কিছু নাম উল্লেখ করা যেতে পারে, যেমন ডাঃ চিনিবাস মুর্মু, অর্জুন বাস্কে, রমেশচন্দ্র হেমব্রম, দুঃখীরাম মুর্মু, কিশুন হেমব্রম প্রমুখ।[১৬] মিশনারী পরিচালিত নর্ম্যাল স্কুলের কথা ও বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

জেলায় মোট দুটি নর্ম্যাল স্কুল ছিল। তার মধ্যে একটি চলত আমেরিকান ব্যাপটিস্ট মিশনের উদ্যোগে, বিশেষত সাঁওতাল স্কুল গুলির দিকে লক্ষ্য রেখে, হান্টারের বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, ব্যাপটিস্ট মিশনারিরা বছরে দুবার সাঁওতাল শিক্ষকদের মেদিনীপুরের কোন একটি গ্রামে ডেকে পাঠাতেন এবং নিজেরা তাঁদের পরীক্ষা নিতেন। হান্টার সাহেব নিজেও কখনো এই পরীক্ষা ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করে মতামত দিতেন। সরকার পরিচালিত নর্ম্যাল স্কুলে হান্টার সাহেব একজন সাঁওতাল ছাত্রকে ভর্তি করিয়েছিলেন, যে তাঁর দেখা সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও উন্নত মানের সাঁওতাল ছাত্র ছিল এবং যাকে ব্যাপটিস্ট মিশন পরবর্তীকালে তাদের স্কুলগুলির পরিদর্শক করেছিলেন।[১৭] ম্যাকাল পিনের রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে মেদিনীপুরের সাঁওতালদের জন্য শিক্ষা সম্বন্ধে তথ্য খুবই কম ছিল। মিশনারিদের নেতৃত্বে ৪৫টি প্রাইমারি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। যেখানে সাঁওতাল এবং অন্যান্য আদিবাসীরা লেখাপড়া শিখত।

প্রত্যেকটি স্কুলে গড়ে ২০ জন ছাত্রছাত্রী ছিল। একসাথে ৯০০ বালক এবং ১৯০ জন মেয়ে লেখাপড়া শিখত। এইসব স্কুলগুলোকে সাঁওতালদের দিয়েই পরিচালনা করা হতো। শেষ দুবছরে বহিরাগত শিক্ষকদের দিয়ে সাঁওতাল পরীক্ষার্থীদের লেখাপড়া শেখানো হতো।[১৮] মেদিনীপুর জেলা বোর্ড আদিবাসী ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রাক প্রাথমিক বৃত্তি চালু করেছিল, ঝাড়গ্রামে অনেক স্কুল সাঁওতাল সংগঠনের সাথে যুক্ত ছিল সেখানকার শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল প্রায় বাঁকুড়ার মতোই। কিন্তু সুবর্ণরেখার দক্ষিণ প্রান্তের শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল খুবই খারাপ। মিশনারি শিক্ষা পদ্ধতির প্রভাব বিনপুর, গড়বেতা, শালবনী এবং ঝাড়গ্রামে খুব ভালো ছিল। ঐ সময় বহু পাঠশালা ছিল যেগুলিতে সাঁওতাল ছেলেমেয়েরা পড়তো। যেমন রোহিনী-তে একটি গুরুমহাশয় পড়াতেন তার পাঠশালাটি-তে ২৫ জন ছাত্রছাত্রীকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য গুরুমহাশয় মাসে ৪ থেকে ৫ টাকা মাসিক বেতন পেতেন। আবার ছাত্রছাত্রীরা সবাই মাসিক বেতন একই টাকা দিতেন না। কেউ ২ আনা আবার

কেউ ৪ আনা দিতেন।[১৯] অন্তিতে একটা পাঠশালা ছিল, ঐ পাঠশালার শিক্ষক ছিলেন একজন ভূমিজ তার ৩০ জন ছাত্র ছাত্রী ছিল, যার মধ্যে ১০ জন ভূমিজ এবং ২০ জন সাঁওতাল। পারিশ্রমিক হিসেবে শিক্ষক মহাশয় ২-৮ টাকা বা ৩টাকা মাসিক হারে বেতন পেতেন।[২০] মেদিনীপুরে আমেরিকান ব্যাপটিস্ট মিশনগুলি প্রতিবেশি এলাকায় তখন বেশ কিছু বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেছিল। ম্যাকালপিন লিখেছেন, আমি (ম্যাকালপিন) তৎক্ষণাৎ ঐ সাঁওতালদের কাছে গিয়ে সাক্ষাৎ করেছি, যারা মিশনারিদের অধীনে লিখতে পড়তে শিখেছে। আমি সাক্ষাৎ করে বুঝেছি, সাঁওতালদের শিক্ষার উন্নয়নের জন্য সরকার সাহায্য করেছে। সরকারি সাহায্য পেয়ে গ্রামীণ বিদ্যালয়গুলির শিক্ষা ব্যবস্থা আগের থেকে অনেক ভালো হয়েছে।[২১] ১৯১১ সালের মেদিনীপুর জেলা গেজেটিয়ার থেকে জানা যায় যে, মেদিনীপুর জেলায় ৮টি গুরু ট্রেনিং স্কুল ছিল সেখানে ট্রেনিং নিয়ে প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষক হওয়া যায়। প্রত্যেক গুরু ট্রেনিং স্কুলের একটি করে সরকারি প্রাইমারি স্কুল ছিল। উক্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে, বিনপুর থানায় আমেরিকান ব্যাপ্টিস্ট মিশন পরিচালিত একটি গুরু ট্রেনিং স্কুল ছিল। গুরু ট্রেনিং স্কুল থাকার অর্থ সেখানে প্রাইমারি স্কুলও ছিল। ম্যালী সাহেব লিখেছেন যে এই গুরু ট্রেনিং থেকে পাস করা ছাত্রেরা সাঁওতালদের জন্য স্থাপিত মিশনারি স্কুলে শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হতেন। এই স্কুল ছাড়া আরও ৫৯টি মিশনারি স্কুল ছিল সাঁওতাল সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েদের জন্য, ১৯০৮-০৯ সালে এই স্কুলগুলোতে ২৭৮৪ জন সাঁওতাল ছেলে মেয়ে পড়তো বলে জানা যায়। মিশনারিদের পরিচালিত স্কুল গুলোতে আদিবাসী শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার তত্ত্বাবধান এর জন্য দুজন গুরু ইন্সট্রাক্টর নিয়োগ করা হয়েছিল এবং পরে মেদিনীপুর বাঁকুড়া ও বীরভূমের সাঁওতালি স্কুল গুলো তত্ত্বাবধান এর জন্য একদল সাঁওতালি ভাষা জানা বিদ্যালয় পরিদর্শক নিয়োগ করা হয়েছিল। এই স্কুলের আদিবাসী শিক্ষার্থীদের বিনা ব্যায়ে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থাও করেছিলেন।[২২] সর্বোপরি বলা যায় ঔপনিবেশিক পর্বে শিক্ষার পরিবেশ মেদিনীপুর জেলায় থাকলেও জেলার পশ্চিম প্রান্তে বসবাসকারী মানুষের জন্য তেমন কোনো ব্যবস্থা ছিল না। তাই ঐ সমস্ত অঞ্চলগুলিতে খ্রিস্টান মিশনারি গণ শিক্ষা বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। শিক্ষা বিস্তারে মিশনারী সম্প্রদায় কিছু বাধার সম্মুখীন হয়েছিল, সেই বাধা সমূহকে মোকাবিলা করে দরিদ্র সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের সূচনা ও তাদের ভবিষ্যৎকে সুগঠিত করেছিল, হয়তো ব্যাপক আকারে পরিবর্তন আনতে পারেনি আবার ব্যাপক পরিবর্তন করাটাও সেই সময় অনুকূল ছিল না। ঔপনিবেশিক পর্বের কর্মপ্রয়াস সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক অর্থনৈতিক শিক্ষা স্বাস্থ্য ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছিল।

সূত্রনির্দেশ

১) শক্তিপ্রসাদ দে, মেদিনীপুর শহরকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার বিবর্তন ও বৈচিত্রঃ উনবিনংশ শতাব্দীর প্রেক্ষিতে, মঞ্জু চট্টোপাধ্যায় (সম্পা), পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, কলকাতা, ইতিহাস অনুসন্ধান-২৪, ২০১৩, পৃষ্ঠা-৮৪৫।

২) ড. সুজয়া সরকার, মেদিনীপুর জেলার পাঠশালাঃ বিন্যাস ও বিবর্তন, ফোকাস, সংখ্যা-৪, ২০১১, পৃষ্ঠা-১৩৩।

৩) L.S.S. O'Malley, Bengal District Gazetteers, Midnapore, 1st Edition 1911, 1 st Reprint, 1995, Calcutta PP. 193, 196.

৪) শেখর মহাপাত্র, ঔপনিবেশিক মেদিনীপুর, উনবিংশ শতকে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও মধ্যবিত্ত শ্রেনি, অসীম কুমার

সরকার, কৌশিক চক্রবর্তী ও মানস দত্ত সম্পাদিত, প্রচলিত ইতিহাসের বাইরে, বাংলার এক অচর্চিত চলচিত্র, কলকাতা, ২০১৫, পৃষ্ঠা-২৪৮।

৫) প্রনব রায়, মেদিনীপুর ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিবর্তন, তৃতীয় খন্ড, কলকাতা, ২০০২, পৃষ্ঠা-৪৫।

৬) Ranjan Chakrabarti, Dictionary of Historical places Bengal 1757-1947, New Delhi, 2013, Page-300-301.

৭) মধুপ দে, ঝাড়গ্রাম ইতিহাস ও সংস্কৃতি, কলকাতা, ২০১৩, পৃষ্ঠা-১৯০।

৮) রণজিৎ ঘোষ, যুগে যুগে ভারতের শিক্ষা, কলকাতা, ১৯৬৪, পৃষ্ঠা-২১-২২।

৯) অশোক পাল, আলোর দিশারী, কলকাতা, ২০০৭, পৃষ্ঠা-৯।

১০) West Bengal Satate Archive, Kolkata, Proceedings-92-94, October, 1872.

১১) রেভারেন্ড তুষার টুডু, আর্লি হিষ্ট্রি অফ আমেরিকান ব্যাপটিষ্ট চার্চ, ভীমপুর, ড. আলোক মান্ডি (সম্পা), আমেরিকান ব্যাপটিষ্ট চার্চ ভীমপুর, স্যুভেনিয়র, ২০০২।

১২) W.W.Hunter, A Statistical Account of Bengal, Kolkata, 1876, Page- 176.

১৩) ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে, সাঁওতালি ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথমখন্ড, সুবর্ণরেখা, ২০১০, পৃষ্ঠা-১০২-১০৩।

১৪) ধীরেন্দ্র নাথ বাস্কে, সাঁওতালি ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথমখন্ড, সুবর্ণরেখা, ২০১০, পৃষ্ঠা-৮৬, ১০২।

১৫) অশোক পাল, মেদিনীপুরের নারী শিক্ষা অলিগঞ্জ ঋষি রাজনারায়ন বালিকা বিদ্যালয় (১৮৬১-২০১০), কলকাতা, ২০১৫, পৃষ্ঠা-২৯।

১৬) ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে, সাঁওতালি ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খন্ড, সুবর্ণরেখা, ২০১০, পৃষ্ঠা-১১৫।

১৭) W.W.Hunter, A Statistical Account of Bengal, Kolkata, 1876, Page- 178.

১৮) M.C. Mcalpin, Report on the condition of the sonthals in the Districts of Birbhum, Bankura, Midnapore and North Balasore, Culcutta, 1909, Page-57.

১৯) তদেব, পৃষ্ঠা-৫৭।

২০) তদেব, পৃষ্ঠা-৪৭।

২১) তদেব পৃষ্ঠা-৫৬।

২২) L.S.S.O'malley, Bengal District Gazetteers (Midnapore), Calcutta, 1995, Page-198-199.